Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

"কি ধরনের আর্থসামাজিক বিন্যাসে আমাদের সংগ্রামের উপাদানগুলি বিকশিত হবে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক এক মেরুসর্বস্ব মহাদানব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যে, সেটাই জানতে হবে। অন্য অনেক পথই খুলে যাবে দেশে দেশে, যার মাধ্যমে এই দুনিয়াটি বদলে ফেলার শর্তগুলি ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।"

—কম. ফিদেল কাস্ত্রো

গণবার্তা

সূচি.....

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
গতানুগতিক পথে নয়...	১
দেশে বিদেশে	২
প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন...	৩
কেমন আছে আমার স্বদেশ	৪
২৬ নভেম্বর আরএসপি'র ডাকে দিল্লি চলুন	৫
মানুষ মারা নীতির বিরুদ্ধে...	৬
মোদী-মমতার পৌষমাস...	৭
গোসাবার উপনির্বাচন সম্পর্কে	৮

68th Year 38th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 13th Nov & 20th Nov. 2021 Joint Issue

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে ভারতের ভূমিকা কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থেই

ভারত নাকি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে! কবির এই আশাই যেন বাস্তবায়িত করার দায় নিয়েছে ভারত সরকার। গত ১৩ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে স্কটল্যান্টের গ্লাসগোতে জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলনে মোদীর উপস্থিতি এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে একান্তভাবে পুঁজির স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ষড়যন্ত্রে তিনি অন্যতম কুশীলব।

ভূ-উষ্ণায়ন ঠেকাতে কয়লার ব্যবহার ধীরে ধীরে একদম বন্ধ করার যখন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে অধিকাংশ দেশ, তখনই ভারতের বাধা। একদম বন্ধ করার বদলে ধীরে ধীরে কমিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব এল। দু'সপ্তাহ ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলো পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধান্বিত; তর্ক বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল, তারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অবশেষে ভারতের চালাকিপূর্ণ প্রস্তাবটাই সম্মেলনে গৃহীত হল। এভাবেই বিশ্বপ্রকৃতির সর্বনাশের পথে এক ধাপ এগিয়ে এল ফ্যাসিবাদী মোদী শাসিত ভারত সরকার। দুনিয়ার কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসনের স্বার্থে ভারত সহ গরিব দেশগুলির জনসমাজের উচ্ছেদ করে অবাধে চলবে খোলামুখ কয়লা খননের কাজ। কে পরোয়া করে! প্রাক-শিল্পদ্যোগ যুগের চেয়ে যেন কিছুতেই ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড না বাড়ে, সেই শপথের কথা! এই হল ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভের কল্পকথা।

ছোট ছোট দেশগুলি ভীষণ বিরক্ত, উদ্বিগ্ন ও ভারতের ভূমিকায় হতাশ। কয়লার ব্যবহার ফেজ আউটের বদলে ফেজ ডাউন শব্দের বদল আমাদের প্রিয় বসুন্ধরার কি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে তা অকল্পনীয়। বোঝার ক্ষমতাই নেই ভারতের বর্তমান শাসক দলের। গত দুই সপ্তাহ ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন তর্কবিতর্ক চলার পর এই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অনেক রাষ্ট্রই একে পর্বতের মূষিক প্রসব বলে ব্যঙ্গ করছে। অনন্যোপায় হয়ে কর্পোরেট মহলের রোষানল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্তকেও মন্দের ভালো বলে অনেকে মেনে নিচ্ছে। সুইৎজারল্যান্ড এবং মেক্সিকোর বক্তব্য, আইন অনুযায়ী কয়লা সংক্রান্ত ভাষ্য শেষ মুহূর্তে বদল করা যায় না। তবুও পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা মেনে এই সিদ্ধান্তকে হজম করতে হচ্ছে। সুইস পরিবেশমন্ত্রী সোন্মারুগা সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি বলছেন যে, শিল্পোদ্যোগ যুগের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার সীমা অতিক্রম না করার লক্ষ্যমাত্রা কিছুতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সম্ভব হবে না।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেছেন, আমাদের প্রিয় ধরিত্রী আজ আমাদের অবিমৃষ্যকারিতায় ধ্বংসের মুখোমুখি। আর আমরা এই মহা বিপর্যয়কে লোভের তাড়নায় সাদরে আহ্বান করছি। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী বিল হেয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক শপথ নিয়ে উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে চলেছেন। তিনি ভারতের ভূমিকায় তীব্র অসন্তুষ্ট। বাধ্য হয়ে বলেছেন, এতদিন পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতের ভূমিকা কখনোই খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু এবার খোলাখুলি নির্লজ্জের মতো সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে ভারত সরকার।

গ্লাসগোর এই জলবায়ু সংক্রান্ত সম্মেলন-এর চূড়ান্ত সার্থকতা হিসেবে তিনটি মাত্রা স্থির করা হয়েছিল। প্রথমত, ২০৩০ সালের মধ্যেই কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন অর্ধেক করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ গরিব দেশগুলিকে বছরে উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা করতে হবে। তৃতীয়ত, এই সহায়তার অর্থ থেকে ৫০ শতাংশ পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকানোর স্বার্থে গরিব দেশগুলিকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সম্মেলনের শেষ দিনে কিছুতেই এই সার্থকতার মাত্রায় পৌঁছাতে না পারার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল গুতেরেস ভীষণ, ভীষণই ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। এই সম্মেলনে সভাপতি অলক শর্মা সম্মেলন-এর ফলাফল দেখে একটি মূল্যবান পর্যবেক্ষণ করেছেন। এইসব সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত কখনোই সার্থকতা শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বলা হয় অগ্রগতি। গাড়ি কয়লা অর্থ এবং গাছ, এই চারটি বিষয়ে অগ্রগতি এখনো পর্যন্ত প্রতিটি একক ব্যক্তির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থের সীমা যে ব্যক্তি পুঁজি মুনাফা ও ভোগের সীমায় বন্দি, ইঙ্গিতে সেই দিকেই নির্দেশ করেছেন অলক শর্মা।

গতানুগতিক পথে নয়, গণআন্দোলন তীব্রতর করেই এগোতে হবে

বিগত ১৪, ১৫ অগস্ট আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। নয়াদিল্লি শহরে অনুষ্ঠিত এই সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেসবের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিগত প্রায় সাত বছরেরও বেশি সময় যাবৎ চলমান মোদী সরকারের বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি সম্পর্কিত আলোচনা। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে informed opposition বা পরিচ্ছন্ন বোধ সমন্বিত বিরোধিতা গড়ে তোলা আশুপ্রয়োজন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আগামী ২৬ নভেম্বর আর এস পি'র একক আহ্বানে দিল্লি অভিযান। সেই গণ অভিযান সফল করতে দলের সর্বস্তরে আলাপ আলোচনা সুচারু পথে চলার জন্যই একটি পুস্তিকা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। একই ধরনের পুস্তিকা দলের অন্যান্য প্রদেশের কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজি ও হিন্দিতেও প্রকাশ করা হয়েছে।

পুনর্বার উল্লেখ করতে হয় যে, আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটির সুস্পষ্ট মত যে, অচেতন মানুষ উন্নত জীবনের অধিকার দাবি করতে পারে না। তাঁরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে পারেন। কখনও চীৎকার করে তাঁদের জীবন যন্ত্রণা সম্পর্কে অনুশোচনা করতে পারেন। হতাশায় নিমজ্জিত হতে পারেন। তাঁদের অব্যক্ত যন্ত্রণা উপশমে সমাজের একই অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে গোলযোগ তৈরি করে শাসকশ্রেণি তাদের সৃষ্ট সংকটের স্বরূপ গোপন করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালনা করতে পারে। সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ অনেকক্ষেত্রেই এই ভুল পথকেই সঠিক বলে ধরে নেন। বিশ্বের নানাদেশের ইতিহাসেই এই ধরনের উদাহরণ রয়েছে। এমন সমস্ত অচেতন বা অর্ধচেতন মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া অবশ্যই প্রকৃষ্ট মানবিক বোধের পরিচায়ক।

আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটি সেই কারণেই দলের সমস্ত স্তরে নেতা কর্মীদের আরও সচেতন করার কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে তৎপর। এই লক্ষ্যে সফল না হলে informed opposition সম্ভব হবে না। সেই বিরোধিতার কর্মকাণ্ডে সমাজের নিপীড়িত অংশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজও অধরা থেকে যাবে। দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবশ্যই সমাজ পরিবর্তনের পথে চলা। এছাড়া অন্য সবকিছুই নিরর্থক। দল গঠনের সঠিক পথ সম্পর্কে কমরেডদের মনোযোগী করে তোলা এই সময়ের মুখ্য দাবি। এই দাবি পূরণ খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে আমাদের বিপক্ষের কেউ শত্রু নয়। অন্যের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে কোনো লাভ নেই। অতীব সন্তর্পণে এবং যত্নের সঙ্গে কঠোর আত্মসমালোচনা করেই ধীর কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। দিল্লিতে আমাদের দলের ঐতিহাসিক কর্মসূচিকে সফল করতে যেমন শারীরিক পরিশ্রম জরুরি, একইভাবে জরুরি বৌদ্ধিক শক্তি সংহত করার উদ্যোগ।

কেন্দ্রীয় কমিটি এমন উদ্যোগ আরও পরিব্যাপ্ত করার জন্য রাজ্যে রাজ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করে। এখনও পর্যন্ত যেসব সংবাদ রাজ্য কমিটিগুলির কাছ থেকে পাওয়া গেছে তা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। কেরল, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে প্রচার আন্দোলনে বিশেষ জোর দিয়ে বহু মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। নানা স্থানে ইতোমধ্যেই পথসভা, দেওয়াল লিখন, পোস্টারিং প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার অভিযান চলছে। এসবের সঙ্গেই গণঅর্থসংগ্রহ অভিযানও চলছে। অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে বহুসংখ্যক কমরেডের মধ্যে।

এই উৎসাহজনক মানসিকতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে দলের বিভিন্ন রাজ্য কমিটিগুলিকে সুচিন্তিত কর্মসূচি নিতে হবে। ২৬ নভেম্বর-এর কর্মসূচি কিন্তু ওইদিনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নতুন পথে চলার জন্য প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরে নিতে হবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তায় আন্দোলন, সাধারণ মানুষের সংগঠিত এবং সচেতন উদ্যোগ গড়ে তোলা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই পথে দৃঢ় মানসিকতা চলতে হলে দ্বিধা সঙ্কোচ দূর করে একটির পর একটি কর্মসূচির কথা ভাবতেই হবে। কোনো সময় সেইসব কর্মসূচি অন্যান্য সমমনস্ক দলের সঙ্গে মিলিতভাবে হবে। কখনো বা আর এস পি'র একক উদ্যোগে সাহস করে কর্মসূচি নিতে হবে। ২৬ নভেম্বর সেই সাহসী পদক্ষেপকে বাস্তবায়িত করবে। যে জাড্য বা স্থবির অবস্থা নানা কারণে তৈরী হয়েছে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। মানসিক বাধাগুলি দূর হলেই আরও কর্মসূচির বিষয় ভাবা যেতে পারে। সেদিকে নজর রেখেও কেন্দ্রীয় কমিটি ২৬ নভেম্বর দিল্লি জমায়েত আহ্বান করেছে।

খুব সহজে এবং স্বচ্ছন্দেই এই কর্মসূচি সফল করা সম্ভব হবে, এমন না ভাবাই ভাল। দিল্লি শহরে এই সময় অর্থাৎ দীপাবলীর বাজি পোড়ানোর পরে বিশেষ পরিবেশগত সমস্যা তৈরী হয়। প্রতি বছরই হয়। এবছরে হয়তো করোনা অতিমারিতে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া রাজধানী শহরে এক আতঙ্কও সৃষ্টি হয়েছে। অতিমারিকালে নানা ধরনের বাধাবিপত্তি চাপানো হয়। দিল্লিতে কোনো ধর্মশালা পাওয়া যাচ্ছে না। একরাত কি দু'রাত থাকার মতো জায়গা পাওয়া এক অসম্ভব প্রকল্প। দলের দিল্লি রাজ্য কমিটি অত্যন্ত সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করেও সকলের থাকার মতো সুব্যবস্থা করতে পারেনি। অতএব, দলের বহু কমরেডকেই শীতের মধ্যেও কষ্ট করে রাত কাটাতে হবে। অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে কোথাও কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। এটা আশ্বস্ত হবার বিষয়। যা লক্ষণীয়, তা হল, বহু সংখ্যক নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণি থেকে আগত কমরেডরা তাঁদের নিজস্ব

এরপর ৪-এর পাতায়

বর্তমান ভারতের দুই কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা বোর্ড— অপরিণামদর্শিতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ভয়ঙ্কর নজির স্থাপন করেছে

সম্প্রতি সি বিএস ই এবং সি আই এস সি ই দুই কেন্দ্রীয় স্কুল শিক্ষা বোর্ড এই বছর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নিয়ে যা করেছে তা উদ্বেগজনক বললেও যথেষ্ট কম বলা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড দুটির পরিকল্পনাবিহীন ব্যবস্থা দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ও অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই বৎসর প্রথমে অন লাইন এবং পরে অফলাইনে পরীক্ষা হবে। প্রথমটি এম সি কিউ (Multiple Choice Question), পরেরটি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী। কিছুদিন পর এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল : দুটি পরীক্ষা অফলাইনেই হবে। সম্ভবত ১৮ বছরের নীচের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের কোভিড সংক্রমণ নিরোধক টিকার ব্যবস্থা করা হয়নি বলেই প্রথম সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল। তাহলে কি ধরে নেওয়া হবে অল্প কয়েকদিনের মাথায় টিকাকরণের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলেই সিদ্ধান্ত বদল করে দুটি পরীক্ষাই অফলাইনে নেওয়া হবে। টিকাবিহীন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। দুই-দুই বার অফলাইন পরীক্ষারই বা যৌক্তিকতা কী? উত্তর নেই। টিকাকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি অথচ ছাত্রছাত্রীদের অফলাইন পরীক্ষায় বসতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন? উত্তর নেই। একেই কী বলে তুঘলকী জমানা!

তর্কপ্রিয় ভারতীয়দের এযাবৎকালের ঐতিহ্য বর্তমান ভারতে আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। অভিভাবক সমাজ তথা নাগরিক সমাজ কিছু বলে না, প্রশ্ন করে না। এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের কাছে দুঃসংবাদ সর্বব্যাপ্ত এই প্রশ্নহীনতায় যে সঙ্কট ঘটতে পারে তাই ঘটছে। শাসক সম্প্রদায় বা দল শিক্ষা নিয়ে যে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন ছিল। নাগরিক সমাজ ব্যর্থ হয়েছে। আজকের ভারতের নাগরিক সমাজ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ীই শাসক পেয়েছেন। এই পুরনো কথাটির বাস্তবতা ফের নতুন ভাবে প্রমাণিত হল।

শি জিন পিং-এর দেশে শাসক বিরোধী সংবাদ বরদাস্ত করা হয় না

চিনা ধনতন্ত্র নামক বিচিত্র অর্থনীতির দেশে চিন বিরোধী সংবাদ প্রকাশের জন্য এক মহিলা সাংবাদিক ঝ্যাং ঝান জেলে এখন প্রায় মৃত্যুর মুখে পড়তে চলেছেন।

মহিলা সাংবাদিক ঝ্যাং ঝানের অপরাধ, তিনি উহানের কোভিড পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং চিনা স্বাস্থ্য দফতরের ব্যর্থতার সমালোচনা করে খবর প্রকাশ করেছিলেন। কোভিড মোকাবিলায় কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির হাল নিয়ে রিপোর্ট করেছিলেন এই সাংবাদিক। এই ধরনের খবর প্রকাশের কয়েক মাসের মাথায় তাঁকে প্রশাসন আটক করে। প্রায় সাত মাস পুলিশ হেফাজতে থাকার পর আদালত ঝ্যাং ঝানকে চার বছরের কারাদণ্ড দেয়। মানবিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ করে এই মহিলা সাংবাদিক আমরণ অনশন শুরু করেছেন। তাঁর অনশন ভঙ্গের হাজার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় মৃত্যুর মুখে এখন এই সাংবাদিক।

মানবাধিকারের উপর এই হামলার প্রতিবাদে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঝ্যাং-এর পাশে দাঁড়ালেও আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্টানের কোনও হেলদোল নেই।

আসলে ১৪৩ কোটি মানুষের বিশাল দেশে এক ব্যক্তি মানুষ মধ্যযুগীয় সম্রাটের মতো একচ্ছত্র ক্ষমতা সহ রাজনৈতিক শীর্ষে আজীবন থাকার ব্যবস্থা করতে সফল হলে সেই দেশকে চিনের চারিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনও নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না—এমন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতেই থাকবে এমন দেশে। আজকের চিনে গণতন্ত্র বিরোধী এমন অসংখ্য ঘটনাই ঘটছে, সব খবর আমরা পাই না, পেতে পারি না। ফ্যাসিবাদী এক নায়কের চারিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধশালী আজকের চিনে এক ব্যক্তিমানুষ আজীবন রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতে চলেছেন—এটাই ইতিহাসের করুণ পরিহাস।

আমাদের এই মহান ভারতে এমন ঘটনা অবশ্য আকছারই ঘটছে—সে অবশ্য অন্য গল্প। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং তথাকথিত বা বহুল প্রচারিত সমাজতন্ত্রের ফলিত প্রয়োগে কোন পার্থক্য আছে কী?

রাশিয়া সহ গোটা ইউরোপেই করোনা সংক্রমণ ঊর্ধমুখী

রাশিয়ার সরকারি সংবাদ অনুযায়ী শুধু অক্টোবরেই ঐ দেশে ৪৪ হাজারেরও বেশি মানুষ কোভিডের আক্রমণে মারা গিয়েছেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওই দেশে এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। শঙ্কার বিষয় ইউরোপের সর্বত্রই এবং মধ্য এশিয়ায় নয়া সংক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়বে। এই শীতে অন্তত ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে ইউরোপে। হু-র প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী এ সপ্তাহে কমপক্ষে ১৮ লক্ষ মানুষের সংক্রমণ ধরা পড়েছে ইউরোপে। জার্মানীর অবস্থাও আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। মৃতের সংখ্যার নিরিখে ইউক্রেন ও রুমানিয়ারও খুবই খারাপ পরিস্থিতি। হু-র ইউরোপ শাখা থেকে জানা গিয়েছে ইউরোপের পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ইতিমধ্যেই রেকর্ড সংখ্যক করোনার প্রকোপ বেড়েছে। বর্তমান অবস্থা ঠিক—এক বছর আগের অতিমারির পরিস্থিতিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, করোনা সংক্রমণ ''এনডেমিক'' অর্থাৎ ভাইরাল অসুখ হিসাবে এই গ্রহটিতে থেকে যাবে। টিকার পাশাপাশি নিরাময়ের জন্যও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ্লাসগোর জলবায়ু সম্মেলনে দু-সপ্তাহ ব্যাপী তরজার পর শেষমেষ অশ্বডিম্বই প্রসব হল

দু সপ্তাহব্যাপী ৩১ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর সিওপি ২৬ সম্মেলনের শেষ দিনে সভাপতি অলোক শর্মার কথাতে শোনা গেল ব্যর্থতার সুর, ''আমি গভীর ভাবে দুঃখিত''। সিওপি সম্মেলনের শুরুতেই সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রিন হাউস গ্যাসের মূল উৎস কয়লা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ভারতের দাবি ছিল, পুরো বন্ধ না করে কয়লার ব্যবহার ধাপে ধাপে কমাতে হবে। বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র নেতাদের ভাষণে বিশ্ব জুড়ে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করার ওপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী বছরের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে রাখার লক্ষ্যে আরও কার্বন নিঃসরণ কমাতেই হবে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব।

আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেও গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তির বয়ান ভারত হঠাৎ এমনভাবে বদল করেছে যাতে, পরিবেশ আন্দোলনকারী থেকে শুরু করে সবাই স্তম্ভিত। কী সেই বদল? প্রথমে স্থির হয়েছিল বিশ্বজুড়ে কয়লা ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হবে। শেষ মুহূর্তের আলোচনায় এই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গটি উঠে আসে। সকলের সম্মতিতেই চুক্তির ভাষা বদল করা হল এবং মুখ দিয়ে তা বলানো হল—যার মর্মার্থ হল, কয়লার ব্যবহার এখনই বন্ধ করা হবে না, ধাপে ধাপে বন্ধ করা হবে। অর্থাৎ কয়লার ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না এখনই, কমানো হবে মাত্র। তবে ঘোষণায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিষয়টি নিয়ে আগামী বছর আরও আলোচনা হবে। সারা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল আপাতত।

সুইৎজারল্যান্ড সহ বেশ কিছু দেশ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। অভিযোগ, ভারত শেষ মুহূর্তে এই কাজ করল। অবশ্য কার্বন নিঃসরণের জন্য ভারত ছাড়া দায়ী অপর দুই পান্ডা আমেরিকা - চিনের সম্মতিতেই ভারত আচমকা চুক্তির বয়ান বদল করে ফেলেছে।

বিশ্বের দূষণ সৃষ্টিকারী প্রধান তিনটি দেশ চিন, আমেরিকা এবং ভারত সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—আগামী এক দশকে কার্বন নিঃসরণ একেবারে শূন্য করে ফেলবে। কিন্তু সম্মেলনের শেষে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শেষ মুহূর্তে চিন ও ভারত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং আমেরিকা নিঃশব্দে তা মেনে নিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, সব জেনে বুঝেই শেষ মুহূর্তে চুক্তিপত্রের ভাষা বদল করা হয়েছে—এখনই কয়লার ব্যবহার বন্ধ করার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে কমানো হবে এবং তাপ বদলের দায়টা ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য ও সিওপি-২৬-এর সভাপতি অলোক শর্মা বলেন—''যেভাবে সবটা করা হয়েছে, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি গভীরভাবে দুঃখিত।''

চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

২০২২ এর পার্টি কংগ্রেসে চিনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির (নভেম্বর ৮—নভেম্বর ১১) ষষ্ঠ প্লেনারি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং-এর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকার মেয়াদ বর্তমানের সর্বোচ্চ সীমা দুই দফার পরিবর্তে তৃতীয় দফাতেও চলবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে শি জিন পিং তৃতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। চিনের কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তে শি জিন পিং রাজনৈতিক চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাও জে দং এবং চিনের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারিগর দেং জিয়াও পিং-এর সমান মর্যাদায় উন্নীত হল।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং-এর যোগ্য নেতৃত্বে চিনের বিপুল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। শি-র নেতৃত্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য, বিদেশ নীতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে সাফল্য সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছে মাও- দেং-শি জিন পিং এই ত্রয়ীর সুযোগ্য পরিচালনায় আজ চিন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। কার্যত তৃতীয়বারের জন্য শি জিন পিং-এর রাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত থাকার অর্থই হল, শি জিন পিং আজীবন রাষ্ট্রপতি এবং দলের প্রধান নেতা হিসাবে চিনের রাজনৈতিক জগতে অবস্থান করতে চলেছেন। অতএব চিনের কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে রাজনৈতিক ভাবে শিন-জিং-পিং কে চ্যালেঞ্জ জানানোর সম্ভাবনা নির্মূল হবে—রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এমনই অভিমত।

‘দিল্লী চলো’র সমর্থনে সালারে প্রচার

আগামী ২৬ নভেম্বর আরএসপি’র ডাকে পার্লামেন্ট অভিযানের সমর্থনে ও ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সালার স্টেশন বাজারে আরএসপি’র উদ্যোগে পথসভা ও পোস্টারিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল গত ১৯ নভেম্বর। এদিনের এই পথসভাকে ঘিরে এলাকার মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আরএসপি নেতা তথা এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক কম. ঈদ মহাম্মদ, সভায় বক্তব্য রাখেন আরএসপি নেতা কম. জামাল চৌধুরী, পিএসইউ নেতা চৌধুরী কম. গোলাম মর্তুজা ও পিএসইউ-এর রাজ্য রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। সভা থেকে আহ্বান করা হয় আগামী কৃষি বিল মুখে প্রত্যাহার করলে শুধু হবে না, অবিলম্বে পার্লামেন্টে অধিবেশনের মধ্য দিয়ে এই আইনকে বাতিল ঘোষণা করতে হবে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি, বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী), শ্রম কোড ও এনআরসি এনপিআর ও সিএএ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে কেন্দ্রীয় আইন সংশোধনের প্রস্তাব

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

দেশের বনভূমি ধ্বংস করে পুঁজি প্রবেশের পথ নিষ্কন্টক করতে আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার জন্য সরকার বনভূমি সংরক্ষণ আইন (ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট) সংশোধন করতে চাইছে। গত ২ অক্টোবর মোদি সরকারের পক্ষ থেকে আইনটির চোদ্দটি সংশোধনী এনে একটি প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রস্তাবে প্রত্যাশিতভাবেই বনভূমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশোধনী আনার কথা বলা হয়েছে। বনভূমি বাঁচাতে বনবাসীদের বনজ সম্পদে সামাজিক মালিকানার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। বনভূমি রক্ষা করার জন্য স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গটিকে লঘু করা হয়েছে। সামাজিক সম্পদককে সরকারি সম্পদে পরিণত করাই যার লক্ষ্য।

পাশাপাশি, সাফারি, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি বাণিজ্যিক কাজে, রাস্তা, রেলপথ নির্মাণের মতো পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলনে বনভূমি ধ্বংস করার পথটিকে আরও সুগম করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুসারে এধরনের কাজে বনভূমিকে ব্যবহার করতে অসুবিধে নেই। অথচ, বনভূমির প্রকৃত রক্ষাকর্তা বনবাসীদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। অর্থাৎ বনভূমি সংরক্ষণ নয়, ধ্বংসই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই ধ্বংসসাধন হবে পুঁজির স্বার্থেই। পুঁজি বিনিয়োগের পথ সুগম করতেই এই সংশোধনীর প্রস্তাব। দেশের জল, জমি, জঙ্গল, খনির ওপর পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সরকার মরিয়া। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সামাজিক মালিকানা তো নয়ই, রাষ্ট্রীয় মালিকানাও নয়। ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠাই আজকে পুঁজিবাদী উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি।

বন সংরক্ষণের নামে তাই দেশের নানা প্রান্তে বনবাসী-মূলবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আবার সেই বনভূমিকেই কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারজন্য পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলিকে অতি নমনীয় করতে সংশোধিত করা হচ্ছে, এমনকি প্রচলিত বিভিন্ন আইনকেও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বনভূমি রক্ষা করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে এই আইনের পরিধি বিস্তৃত হয়। রায়ে বনভূমির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় যে, সরকারি যেকোনো নথিতে উল্লিখিত বনকেই বনভূমির আওতাধীন করা হবে। বনভূমি ব্যক্তিমালিকানাতে থাকলেও তা ধ্বংসের স্বাধীনতা মালিকের হাতে থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বনভূমি যথেচ্ছ ধ্বংসে কোনো বাধা পড়ে নি। নয়া উদারনীতির হাত ধরেই একের পর এক প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন শুরু হয়। তারই প্রতিস্পর্ধায় দেখা যায় প্রতিরোধ। দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় প্রতিরোধ। প্রতিরোধগুলিতে বড় ভূমিকা পালন করে বনবাসী-আদিবাসী মানুষ। উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি সংসদীয় রাজনীতিতে অন্যতম নির্ধারকের ভূমিকায় উঠে আসে। সেই আন্দোলনগুলির উল্লেখযোগ্য ফসল ২০০৬ সালের বনাধিকার আইন। যদিও আইন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব বারে বারেই প্রমাণিত হয়েছে। মোদি সরকারের আমলে আইনট লঘু করার জন্য শুরু হয় নব উদ্যোগ। বনভূমি ব্যবহারে গ্রামসভার ভূমিকাকে খর্ব করতে অন্য আইনগুলিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রস্তাবিত সংশোধনীও বনাধিকার আইনকেই খর্ব করবে। বনভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহারে, খনিজ সম্পদে লুঠে গ্রামসভার অনুমোদনের কোনো গুরুত্বই কার্যত থাকবে না। উলটে সামাজিক মালিকানার অধিকার খর্ব করতে গ্রামসভা, জনশুনানি প্রভৃতির ভূমিকা গুরুত্ব হারাবে।

পরিবেশ সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় রয়েছে। বন সংরক্ষণ আইনেও রাজ্যের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলির মাধ্যমে রাজ্যের ভূমিকাও খর্ব করা হবে। মোদি সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে অতি কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক থেকে পরিবেশ (পড়ুন, ধ্বংসের) নীতিও মুক্ত নয়। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থকেই যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজ করে চলেছে।

ক্রনোলজি দেখলেই সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী আইনে আটকে থাকা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পকে অতি দ্রুত ছাড়পত্র দিতে পরিবেশ মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পাঁচ দিনেই মোট ২৮ হাজার কোটি টাকার ১২টি আটকে থাকা প্রকল্প ছাড়পত্র পেয়ে যায়। কর্পোরেট মহলের দ্রুত আস্থাভাজন হতে সরকার পরিবেশ মন্ত্রকের কাজের খোলনলচেই পালটে দেয়। পরিবেশ রক্ষা নয়, ধ্বংসের ছাড়পত্র দেওয়াই মন্ত্রকের কাজে পরিণত হয়। ইউ পি এ আমলে যে কাজ কিছুটা ধীরগতিতে হচ্ছিল, সেই কাজই রাতারাতি গতিলাভ করে। ইউ পি এ আমলে আন্দোলনের জন্য একের পর এক প্রকল্প বন্ধ বা বাতিল হয়ে যায়। অপারেশন গ্রীন হান্টের মতো চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পথেও বনবাসী-আদিবাসীদের প্রতিরোধ দমন করা যায় নি। ইউ এ পি এ আইন সংশোধন করেও খুব লাভ হয় নি। কর্পোরেট মহলের আস্থা হারিয়ে ইউ পি এ সরকার নীতি পঙ্গুত্বের শিরোপা পায়। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় কর্পোরেট মহলের আশীর্বাদধন্য মোদি তথা বিজেপি'র ক্ষমতায় আগমন। একদিকে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের, প্রতিবাদী বনবাসী-আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, অপরদিকে আইন সংশোধনের পথে কর্পোরেট মহলকে প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের ব্যবস্থা করতে মোদি সরকার যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এইভাবে পরিবেশ ধ্বংসের গতি আরও দ্রুত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের বন আইন সংশোধনের জন্য ২০১৯ সালেই সরকার বিল এনেছিল। লক্ষ্য বনবাসীদের উচ্ছেদ করে প্রাকৃতিক সম্পদে পুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধি। দেশজোড়া প্রতিবাদে সাময়িকভাবে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। গত বছর অতিমারির সময়েই এনভায়েরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের নতুন খসড়া রচিত হয়। সেই খসড়ায় অনেক পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল ও এমনকী কিছু নিয়ন্ত্রণ রদ করার ব্যবস্থা হয়। খসড়া অনুসারে, সংরক্ষিত, পরিবেশগতভাবে বিপন্ন ও অত্যন্ত দূষিত অঞ্চলে নানা কারখানা, ভবন গড়া যাবে। জন শুনানির ব্যবস্থাকে জটিল করা হয়েছে। যাতে জন শুনানির মাধ্যমে কোনো প্রকল্প আটকে না যায় সেটাই লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ জনশুনানির পক্ষে উপযুক্ত অবস্থা নেই মনে করলে, শুনানি বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ গণবিক্ষোভ হলে জন শুনানির ব্যবস্থা রদ করা হবে। এরফলে প্রকৃতি ধ্বংস ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের অপকর্ম গতি পাবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসমাজও ক্ষতিপূরণ পাবে না। সেই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কয়লাখনিগুলি নিলামে চড়িয়ে বেসরকারিকরণের নীতিও নেওয়া হয়। দুটি পদক্ষেপেই বনাধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। বর্তমান সংশোধনী প্রস্তাবনাও তারই অঙ্গ। প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ আটকাতে মোদি সরকার বিরোধী তীব্র আন্দোলনই একমাত্র পথ। আজকের পরিবেশ আন্দোলন পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক : সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় বঞ্চনার আশঙ্কা

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে বাধ্যতামূলক করেছে। স্বাস্থ্যসাথী বা এধরনের অন্য কোনো কার্ড না থাকলে কোনো ব্যক্তি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে চিকিতৎসার সুযোগ পাবেন না। সরকারের যুক্তি স্বাস্থ্যকার্ডে দুর্নীতি রুখতেই এই ব্যবস্থা। এছাড়া ভিন রাজ্যের ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ রুখতেও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতদিন ভুয়ো রেশন কার্ডের কথা শোনা যেত। এখন ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথাও শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে কেন্দ্র করেই দুর্নীতির এক বড় চক্রও নাকি কাজ করছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে অযথা বিল বাড়িয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। ভিনরাজ্যের মানুষকে চিকিৎসা বিনামূল্যে না দেওয়া কতটা মানবিক পদক্ষেপ সে প্রসঙ্গ তো আছেই। সরকার যদি তাও ভাবে, তারজন্য রোগীর বাসস্থান বা বাড়ি জানতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আধার কার্ড তো এখন কার্যত সর্বক্ষেত্রে আবশ্যিক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে এই সিদ্ধান্তের অন্য কারণ নিয়ে।

দুর্নীতি রোখার বাহানা সরকার পক্ষের বহু পুরনো নিদান। প্রশ্ন হল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করার যে নিয়ম সেখানে ভুয়ো কার্ড কীভাবে হতে পারে? সরকারি প্রশাসন ও শাসক দলের যোগসাজশ ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। এখন তো শাসক দলের প্রভাব সর্বত্র বিরাজমান। অভিযোগ, অনেকক্ষেত্রে কার্ড পেতেও শাসক দলের আশীর্বাদ প্রয়োজন হয়। সেখানে শাসক দলের ঘুঘুর বাসা না ভেঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে যাবতীয় দায় চাপিয়ে দেওয়ার যুক্তি কী?

দীর্ঘদিন আবেদন করেও রাজ্যের অনেকেই এখনও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পান নি। কার্ড পেতে তাঁদের হয়রান হতে হচ্ছে। এমনকী অনেকেই একাধিকবার আবেদন করেও পান নি। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে আবেদনকারীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রয়োজন। অনেকে আবেদন করেও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না পাওয়ায় নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আবেদন করলেই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সরকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না পাওয়ার সমস্যাটি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। আবেদন করেও যারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পান নি, তাঁদের সরকারি চিকিৎসার কী ব্যবস্থা হবে? সরকার বলছে সেক্ষেত্রে নাকি হাসপাতালেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করার ব্যবস্থা থাকবে। তারজন্য কিয়স্ক হবে। সরকারি হাসপাতালে রোগী ভর্তি করার সামান্য অভিজ্ঞতাও যাদের আছে, তাঁরা বুঝবেন বিষয়টা কতখানি জটিল। রোগী ভর্তিতেই যেখানে হয়রান হতে হয়, সেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করাতে চূড়ান্ত হয়রানি হবে। কার্ড না থাকার অজুহাতে রোগী ভর্তি না করার আশঙ্কা বাস্তবে থেকেই যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড মহিলাদের নামে হয়। পরিবারে যার নামে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হবে তাঁকেও হাসপাতালে আসতে হবে। গ্রাম থেকে শহরে অনেকটা দূরে রোগী নিয়ে আসলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করতে পরিবারের প্রধান মহিলাকেও সঙ্গে আসতে হবে। বাস্তবে অনেকের কাছে তা অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা জরুরি কেসে রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব ভর্তি করার ক্ষেত্রে এই হয়রানি, সময় নষ্টে জীবনহানির আশঙ্কাও থাকছে।

অভিযোগ, আসলে মানুষকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে ছেঁটে ফেলতেই এই ব্যবস্থা। যেমন রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যোগ করার নামে দেশের অনেক মানুষকে রেশন ব্যবস্থা থেকেই ছেঁটে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, নতুন নিয়মেও তাই হবে। উভয়ক্ষেত্রেই সরকারি অজুহাত দুর্নীতি দমন। আবেদনকারী সকলকে দ্রুত স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিতে, আবেদনকারীর পরিবার যাতে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে আন্দোলনই একমাত্র পথ। আন্দোলনের পথেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় বঞ্চনার এই নয়া ফন্দি বানচাল করতে হবে।

কম. ঊষা সেনগুপ্তের দেহাবসান

কম. ঊষা সেনগুপ্ত নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির প্রাক্তন সভানেত্রী। উত্তর দমদম আর এস পি লোকাল কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা ও উত্তর দমদম পৌরসভার প্রাক্তন উপপৌরপ্রধান কম. ঊষা সেনগুপ্তের দেহাবসান হয়েছে গত ১৭ নভেম্বর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী মতাদর্শের প্রকৃত একজন পরিচ্ছন্ন মিতভাষী নিষ্ঠাবান নেত্রী রূপে আজীবন কাজ করেছেন। সত্যিকারের স্বচ্ছ প্রশাসক ও পার্টি কর্মী অন্ত প্রাণ ছিলেন। পৌরসভায় উপ-পৌরপ্রধান থাকাকালীন অনেক দুঃস্থ পরিবারের কর্মক্ষম বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর অসামান্য দৃঢ়চেতা মানসিকতার জন্য পার্টির বহু সদস্য সহ দমদম এলাকার আপামর জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষস্থানীয় স্তরে পৌঁছেছিলেন। বহুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কম. ঊষা সেনগুপ্ত লাল সেলাম।
কম. ঊষা সেনগুপ্ত অমর রহে॥

কেমন আছে আমার স্বদেশ

আমাদের দেশ ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের অবস্থা মোটেই ভাল নেই। শুধুমাত্র এটুকু বললে বাস্তবে কিছু বলা হয় না। কিছু বোঝা যায় না। মানুষ কত বেশি সমস্যায় আছেন এবং কত রকম সমস্যা প্রতিদিন তাঁদের জীবনকে বিপন্নতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করছে তা, অল্পকথায় বোঝানো অসম্ভব। একইসঙ্গে এত সমস্যা যে, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলা হবে তাই ভেবে ওঠা যায় না। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'শিরে হইলো সর্পাঘাত তাগা বান্দি কোথায়?' বর্তমান সময়ে সেই ধরনের অবস্থারই মুখোমুখি সাধারণ জীবন। প্রবল আক্রমণ প্রতিদিন এমন তড়িৎগতিতে আমাদের জীবনকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এমন এক অবস্থা চলছে যে, এই সর্বব্যাপ্ত সমস্যাগুলির মধ্যে কোনটা আগে সমাধান করা হবে আর কোনটাই বা পরে তা, চিন্তা করেই কোনো কুল কিনারা করা যাচ্ছে না। এমন এক দুর্বিষহ এবং জটিল যন্ত্রণায় দেশের মানুষের জীবন কখনও পড়েনি।

একথা অবশ্যই ঠিক যে, ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন পরিচালনার কথা ভাবে নি। সর্বকালেই অল্প সংখ্যক বিত্তশালীর আরও বিত্ত সন্ধান নিশ্চিত করতেই দেশের সরকার একান্তভাবে দায়বদ্ধ থেকেছে। স্বাভাবিক কারণেই একাংশ মানুষ সুন্দর, স্বচ্ছল এবং বৈভবপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে। এরা মুখ্যত পুঁজির মালিক। অঢেল পুঁজি এদের। তা বিনিয়োগ করে অথবা অন্য কোনো পথে ব্যবহার করে এরা নিজেদের সম্পদ বাড়িয়েছে। এরা নানাভাবে দেশের সরকার পরিচালনার নীতি নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছে বা কলকাঠি নেড়েছে যাতে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি চরিতার্থ হয়। মুনাফা, আরও মুনাফা অর্জনের পথে যেন কোনো বাধাবিপত্তি সৃষ্টি না হয়। এই সব পরিবারগুলির সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করতে বহু মানুষকে দিবারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যথাযথ পারিশ্রমিক তারা পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে বেগার খাটতেও বাধ্য হয়েছে বহু মানুষ। তাদের গৃহকোণে অন্ধকার বারংবার ঘনিয়ে এসেছে। বিত্তগত বিচারে চরম বৈষম্যমূলক অবস্থা চলেছে।

এসব অনাচার বারবারই দেশের বিবেকবান মানুষদের বিচলিত করেছে। অনেকেই প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছেন আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করতে। ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে বারংবার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গঠনের দাবি যেমন উঠেছে, তেমনি দাবি উঠেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং একটি সুস্থ বিজ্ঞানবোধ সম্পন্ন সাম্যবাদী সমাজ বা সমসমাজ গড়ে তোলারও। বহুসংখ্যক উন্নত মেধার মানুষও স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে দিবারাত্রি এক করে পরিশ্রম করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্যি যে, রাষ্ট্রিক প্রশাসনের আক্রমণ নেমে এসেছে তাঁদের ওপর। পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মী রাষ্ট্র পরিচালকদের অঙ্গুলি হেলনে প্রতিবাদ প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে অত্যাচারের স্টীম রোলারও চালিয়েছে।

দৃঢ় ও সুঠাম চেতনার বহু মানুষ এসব সত্ত্বেও নিজেদের আদর্শবোধে অটল থেকেছেন এবং সমাজ প্রগতির পক্ষে ক্রিয়াশীল থেকেছেন। প্রতিদিন যে ক্ষত মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত করেছে তার ওপর সামান্য প্রলেপ দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের জীবন সার্বিক সংকট থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এই কঠোর সত্য মেনে নিয়েও বলা যায়, বর্তমানের মতো ভয়াবহ সমস্যায় অতীতে কখনও দেশের সাধারণ জীবন এভাবে সবদিক থেকে বিপর্যস্ত হয় নি। এমন চূড়ান্ত অমানবিক আচরণে অভ্যস্ত কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই ছিল না। মোদী সরকার সর্ব নিকৃষ্ট।

অনস্বীকার্য, অতীতে শত সমস্যার মধ্যেও দেশের সর্বত্র সংবিধানসম্মত পথে প্রশাসন চলতে সক্ষম হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলেও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল অটুট থেকেছে এবং মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে নানা দানবীয় আইন প্রয়োগ করে মাসের পর মাস প্রতিবাদীদের বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধি জমানায় ইমারজেন্সির সময়কালকে ঘৃণাসহকারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর চরম আঘাত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেইসময় মানুষের প্রতিবাদী সভা যথেষ্ট সক্রিয়ই ছিল।

বর্তমান সময়ের মতো দেশের জেলখানাগুলিতে এত বেশি সংখ্যায় বিচারাধীন বন্দিদের সহজ কথায় হত্যা করা হয় নি। সামান্য প্রতিবাদী গণআন্দোলনের দাবিগুলিকে সংগত হলেও এভাবে নস্যাৎ করে অবহেলা করা হয়নি। কিছুটা হলেও উত্থাপিত সমস্যাবলীর সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু না হলেও উদ্যোগী হয়েছে। আলোচনা বারংবার ব্যর্থ হলেও সরকারের মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ আমলারা ঘন ঘন বসে নানা প্রস্তাব পেশ করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কতটা সততার সঙ্গে সেসব করেছেন তা নিয়ে বহু প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু অতীতে কোনকালেই বর্তমান সময়ের মতো লক্ষ লক্ষ কৃষকের ন্যায্য আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেবার ঘটনা কদাপি হয়নি। অনেক সময় পুলিশি আক্রমণে গণ আন্দোলনকে মোকাবিলায় অপচেষ্টা অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক স্তরে অথবা লোকসভা বা রাজ্যসভায় বিস্তারিত বিতর্কের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজাও হয়েছে। সেইটুকু পথ অবশ্যই এখনকার মতো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় নি।

গতানুগতিক পথে নয়, গণআন্দোলন তীব্রতর করেই এগোতে হবে

১-এর পাতার পর

তাগিদেই দিল্লি পৌঁছে বহুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আওয়াজ তুলতে চান। ২৬ নভেম্বর সকলের কাছেই সেই সুযোগ অবারিত করতে চায়।

২৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় যে প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি দেয়নি অমিত শাহ'র পুলিশ। এমনকি, যন্তর মন্তর পর্যন্ত মিছিলেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। অগত্যা, দলের সমস্ত নেতা কর্মীদেরই যন্তরমন্তর চত্বরে পৌঁছে যেতে হবে। সকাল ১১টা থেকে প্রতিবাদ সভা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সভার কাজ হয়তো চলবে বেলা ২টা পর্যন্ত। সমস্ত কমরেডরাই দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন সহ সভায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা যায়।

বিগত বেশ কিছুকাল যাবৎ দেশ ও রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনকে খর্ব করতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিশেষ তৎপর। যে কোনো মূল্যে বামপন্থাকে দাবিয়ে রাখতেই হবে। না হলে, নয়া উদারবাদের নগ্ন আক্রমণ নিশ্চিন্তে চালানো যাবে না। দক্ষিণপন্থীদের কাছে জনসাধারণের প্রাণধারণের দাবিতে আন্দোলন স্তব্ধ করাই এক বিশেষ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণে ওরা বামপন্থীদের নির্বাচনী লড়াইয়ে যেমন তেমনভাবে পর্যুদস্ত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, বামপন্থীরা জনবিচ্ছিন্ন এবং সাধারণের কাছে তাঁদের কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই।

ইদানিং অনেক বামসমর্থক এমনকি কর্মীরাও নির্বাচনী পরাজয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছেন। ওই পথে গেলে বা শুধুমাত্র ওই পথে চললে আগামীদিনে আরও হতাশার সম্ভাবনা বেশ প্রবল। অথচ জনসাধারণের মৌলিক দাবিগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থীরা কোনভাবেই উৎসাহী নয় এবং তারা গণশত্রু হিসেবেই সতত ক্রিয়াশীল। অতএব, বামপন্থীদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সমস্ত শক্তি সংহত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। গতানুগতিক পথে নয়, নতুন পথেই এই ভয়ানক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে।

বাগান মালিক ও দপ্তরের একাংশের যোগসাজশ

শ্রমিকদের পি এফের টাকা আত্মসাৎ

প্রভিডেন্ড ফান্ডের জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক দপ্তরের কর্মীদের একাংশ ও দালালচক্রের সঙ্গে যোগসাজশ করে বাগান মালিকরা অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পিএফ টাকা আত্মসাৎ করছেন। পি এফ দপ্তরের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ এই অভিযোগ করেছেন।

তাঁর অভিযোগ, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের খাতায় কলমে মৃত দেখিয়ে তাঁদের প্রাপ্য টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এমনকি গোপনে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন থেকে পিএফ-এর টাকা কেটে তা নির্দিষ্ট জায়গায় জমা না করে বাগান মালিকেরা ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। ১৪ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে সহকারী পিএফ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে অশোক ঘোষ এসব অভিযোগ করেন। সহকারী পিএফ কমিশনার গিরীশ নারায়ণ চৌধুরী বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাঁর অভিযোগ পিএফ দপ্তরের এক শ্রেণির কর্মীর সঙ্গে সমঝোতা করে শ্রমিকদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি পিএফ দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে জীবিত শ্রমিককে মৃত দেখিয়ে পিএফ-এর পুরো টাকাটাই তুলে নেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি রায়ডাক, দলমোর, সিংঘানিয়ার মতো বেশ কয়েকটি বাগানের প্রসঙ্গ তোলেন।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের থেকে পিএফ-এর টাকা কেটে নেওয়ার পরও তা জমা না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে পিএফ কর্তৃপক্ষ কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানে ন্যূনতম ১০৩ কোটি টাকা বকেয়া হয়েছে। অবসরগ্রহণ করার পরও উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের একটা বড় অংশ পেনশন পাচ্ছেন না। শ্রমিকদের আবার কার্ডে থাকা তথ্যের সঙ্গে বাগান কর্তৃপক্ষের খাতায় থাকা তথ্য সংশোধনের জন্য বাগানে বাগানে ক্যাম্পের দাবি জানান।

পাশাপাশি, লাইফ সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণে দীর্ঘ লাইন পড়ায় অশোক ঘোষ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের জন্য আলাদা শিবিরের প্রস্তাব দেন।

বৈঠকে উপস্থিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কম. গোপাল প্রধান বলেন, 'পিএফ দপ্তরে এসে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের নানাভাবে হয়রান হতে হচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ারের জেলা সংবাদ

আলিপুরদুয়ারের কম. ননী ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী পালন

গত ৬ নভেম্বর আরএসপি আলিপুরদুয়ার জেলা অফিসে কম. ননী ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে জন্মদিবস উদযাপিত হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরএসপি আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক কম. সুনীল বণিক, পিএসইউ রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব কর্মী সমর্থক।

পি এস ইউ'র কর্মীসভা :

নভেম্বর বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৭ নভেম্বর পিএসইউ আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি লোকাল কমিটির উদ্যোগে পিএসইউ-এর কর্মীসভা আয়োজন করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মীসভাতে উপস্থিত হয়। এদিনের এই কর্মীসভাতে পিএসইউ-এর রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস এবং আজকের দিনে আমাদের বৈষম্যযুক্ত সমাজ গঠনের লড়াই-এর প্রেরণা যোগায় এবং পিএসইউ-এর কর্মীদের দায়িত্ব কি এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। এছাড়াও এদিনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন পিএসইউ রাজ্য কমিটির সদস্য কম. রাজীব হুসেন, আর ওয়াই এফ নেতা কম. কিশোর মিঞ্জ ও আরএসপি নেতা কম. শ্যামল রায়।

গত ৮ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার পিএসইউ মাদারিহাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে ছাত্রদের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কর্মীসভাতে উপস্থিত ছিলেন পিএসইউ-এর রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা, আরএসপি নেতা কম. সুনীল বণিক, কম. প্রদীপ বর্মন। এদিনের কর্মীসভাতে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এই সময়ে পিএসইউ-এর সদস্য সমর্থকদের করণীয় কি এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন। ছাত্রদের আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসে চা-বাগান এলাকার বিভিন্ন ছাত্রদের এই দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লকডাউনের ফলে কিভাবে ড্রপআউট হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিকারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ

২৬ নভেম্বর আর এস পি'র ডাকে দিল্লি চলুন

● করোনায় বেআব্রু সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার চরম দুর্বলতা। মোদি সরকার আলো জ্বালিয়ে, তালি বাজিয়ে ভাইরাস দূর করার নিদান দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে। ভারতে প্রস্তুত অক্সিজেন অন্য দেশে রপ্তানি হয়েছে। আর এ বছর অক্সিজেনের অভাবে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রাণহানি হয়েছে। ভারতে করোনায় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। টিকাকরণ নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। অক্টোবরের মধ্যে টিকা পেয়েছেন মাত্র ২১ শতাংশ দেশবাসী। আঠারো বছরের কম বয়সীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা আজও হয় নি।

● বিগত সাত বছরে দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম অবহেলিত। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বরাদ্দ জিডিপি'র মাত্র এক শতাংশ। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের বিচারে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৭৯তম। লজ্জাজনক।

● বাড়ছে উজ্জ্বল ইন্ডিয়া ও অন্ধকার ভারতের বিভেদ। আর্থিক বৈষম্যের বিচারে বিশ্বে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। করোনায় দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত, অপরদিকে দেশের ১৩ জন ধনকুবেরের সম্পদ ১ লক্ষ কোটি টাকা বা তার বেশি। প্রতিনিয়ত কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সম্পত্তি বাড়ছে। ২০২১ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১তম। নির্লজ্জ মোদি সরকার।

● করোনায় দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৩ কোটি বেড়েছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে চলে গেছেন। আয়ের ব্যবধানের (ইনকাম গ্যাপ) বিচারে দেশের করুণ অবস্থা। গত বছরেই ৬৬ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন কমেছে। এই বিকৃত ব্যবস্থা বেড়েই চলেছে।

● ২০২০-২১ সালে কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয় ২৫.১৭ শতাংশ। অপরদিকে বেড়ে চলেছে পরোক্ষ কর, ভুগছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

● পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগামছাড়া বেড়েই চলেছে। পরিবহন খরচ বাড়ছে। জিনিসপত্রের দামও অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেই চলেছে।

● ২০২০ সালের বর্ষাকালীন অধিবেশনে মোদি সরকার ২৭টি জনবিরোধী বিল সংসদে পাশ করিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম তিনটি কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি আইন। ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিল হয়েছে। কুড়িটির বেশি খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আইনি ব্যবস্থা তুলে দিয়ে খাদ্য নিয়ে অবাধ কালোবাজারি ও মজুতদারির সুযোগ দেওয়া হয়েছে আদানি আম্বানির কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে। চুক্তি চাষের মাধ্যমে কৃষকদের মজুরি শ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থা কার্যত উঠেই যাবে।

● বিগত চোদ্দ বছরের মধ্যে কৃষকের আয় আজ সর্বনিম্ন। ২০২১-২২ সালের বাজেটে কৃষিতে ১১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কমেছে। কমেছে সারে ভর্তুকি। ডিজেল, বিদ্যুৎ এবং জলের দাম ক্রমাগত বাড়ছে।

● নয়া কৃষি আইনে রেশন ব্যবস্থা আগামীদিনে একেবারে উঠে যাওয়ার আশঙ্কা। খাদ্যের অধিকার আজ ভিক্ষায় পরিণত। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সরকারি গুদামে ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পচিয়ে নষ্ট করা হয়েছে, তবুও রেশনে দেওয়া হয় নি। ২০২১-২২ সালের বাজেটে খাদ্যে ভর্তুকি কমেছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা।

● অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন উঠে যাওয়ায় এরমধ্যেই ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের ভর্তুকিও তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

● বিদ্যুৎ আইন সংশোধিত করে ক্রস সাবসিডি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ি থেকে কৃষিকাজ সবেতেই বিদ্যুৎ বিল বহুগুণ বাড়ছে। আমজনতার বিদ্যুত ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নিয়ে শিল্প-বাণিজ্য কোম্পানিগুলির সুবিধে দেওয়া হচ্ছে।

● মোদি সরকারের আমলে ৪৪টি শ্রম আইন তুলে চারটি শ্রম কোড বা বিধির অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্রমিক শোষণ, ইচ্ছেমতো ছাঁটাই, মজুরি না দেওয়ার, বাড়তি মজুরি না দিয়ে যত খুশি সময় কাজ করানোর আইনি অধিকার পাচ্ছে মালিক পক্ষ। ৩০০ বা তার কম শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে এমন সংস্থায় শ্রমিকদের কোনো অধিকারই থাকবে না। সংখ্যা বেশি হলেও বাস্তবে অধিকার আর থাকবে না। তাদের প্রতিবাদ বা ধর্মঘট করার অধিকারও বিপন্ন। শ্রমজীবী মানুষদের শ্রমদাসে পরিণত করা হচ্ছে।

● গত বছর লকডাউনে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শতাধিক প্রবাসী শ্রমিক মারা গেছেন। ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া প্রায় ৯ কোটি শ্রমিকের মধ্যে অধিকাংশই কাজ হারিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও অসংগঠিত শ্রমিক ও ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের তথ্যভাণ্ডার সরকার তৈরি করে নি। দেশের প্রায় ৪৩ কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তাই নেই। সমকাজে সমবেতনের ব্যবস্থা হয় নি। প্রকল্প কর্মীরা সরকারি কর্মীর মর্যাদা পান নি।

● নোট বাতিল ও জি এস টিতে মোদি রাজত্বে আর্থিক মন্দা ভয়ানকভাবে বেড়েছে। অতিমারির আগেই জিডিপি বৃদ্ধির হার কম ছিল। গত বছর তা ঋণাত্মক হয়ে যায়। মন্দা কাটার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কর্পোরেট কোম্পানিগুলির লাভ বেড়েই চলেছে।

● ২০১৭-১৮ সালে বেকারত্বের হার হয়েছিল ৬.১ শতাংশ। ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। ২০২১ সালের অগস্ট মাসে বেকারত্বের হার ৯ শতাংশের বেশি। কর্মরত মানুষের সংখ্যা দু'বছরে কমপক্ষে ২৭ লক্ষ কমেছে। একশো দিনের কাজ মনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দ না বেড়ে এবারের বাজেটে ৩৪ শতাংশ কমেছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

● মোদি সরকারের আমলে চলছে অবাধ বেসরকারিকরণ, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও দেশের সম্পদ বিক্রি। রেল, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিমান, টেলিকম থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও চলছে নির্বিচার বেসরকারিকরণ। বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে সুযোগ করে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। বি এস এন এল, ও এন জি সি, এল আই সিকে রুগ্ন করা হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গেও আপস করে চলেছে কর্পোরেট দালালরা। রাফায়েলের বরাত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যালের বদলে দেওয়া হচ্ছে অনভিজ্ঞ আম্বানি গোষ্ঠীকে। মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণায় কর্পোরেট প্রভাব বাড়ছে। সি এস আই আর, ডি এস টি'র মতো গবেষণামূলক সংস্থার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে আম্বানির জিও ইনস্টিটিউটকে ১০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বি এস এন এলকে দুর্বল করে জিও'র ব্যবসা বাড়ানো হচ্ছে।

● দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কর্পোরেট লুঠ অবাধ করতে বনাধিকার আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ লঘু করছে সরকার। অবাধে লুঠ হচ্ছে দেশের জল, জমি, জঙ্গল, খনি। উচ্ছেদ হচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ। বিপন্ন হয়ে চলেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ।

● মোদির আমলে শিল্পগোষ্ঠীগুলি ধারের টাকা না মিটিয়ে, জালিয়াতি করে ব্যাঙ্কের আর্থিক সঙ্কট বাড়িয়েছে। এখন সেই ডাকাত, প্রতারকদের কাছেই ব্যাঙ্ক বেচতে চায় সরকার। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের নামে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। কর্পোরেট মহলের নির্দেশ মেনে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস সর্বক্ষেত্রে সুদের হার কমানো হচ্ছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত গভীর সঙ্কটে। তারই মধ্যে নানা পরিষেবার চার্জ, জরিমানা বাবদ আমানতকারীদের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। নিত্যনতুন নিয়মে বাড়ছে সাধারণ মানুষের হয়রানি।

● গরীব-নিম্নবিত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ না পেয়ে বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলি থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছেন। এভাবে কোটি কোটি মানুষ ঋণের ফাঁদে জড়াচ্ছেন। মোদি সরকার লজ্জাহীনভাবে মহাজনী কারবারের পক্ষে।

● বেচারাম সরকারের নজর পড়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপতকালীন তহবিলের টাকা নিতে শুরু করেছে সরকার। আগামীদিনে দেশের চরম আর্থিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা।

● প্রতিশ্রুতিমতো বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধারের বদলে বিদেশে পাচার হওয়া কালো টাকার পরিমাণ বেড়েছে। নোট বাতিলে কালো টাকা উদ্ধার হয় নি। বরং কোটি কোটি কালো টাকাকে জিরো ব্যালেন্স একাউন্ট ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। জাল নোটও বন্ধ হয় নি। মোদির ঘোষণামতো সন্ত্রাসবাদ আদৌ কমেনি।

● প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থাকলেও করোনা কালে মোদির উদ্যোগে 'পি এম কেয়ার্স ফান্ড' তৈরী হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পরিচালিত এই ফান্ডের হিসেবের অডিট হবে না। গত বছরেই এই ফান্ডে ৩০০০ কোটি টাকার বেশি জমা পড়েছে। এমন তহবিলের হিসেব তথ্য জানার অধিকার আইনেও জানা যাবে না। অতিমারির সুযোগে এভাবেই কোটি কোটি টাকা নিয়ে দুর্নীতি চলছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো লাভ করছে।

● ইলেকশন বন্ড চালু করে কোটি কোটি টাকা আদায় করছে শাসক বিজেপি। কর্পোরেটের অর্থে বলীয়ান হয়ে প্রচারের চমকে ভোটারদের প্রভাবিত করে চলেছে বিজেপি। ইলেকশন বন্ডের প্রাপ্ত অর্থে ভোটে হেরেও বিভিন্ন রাজ্যে বিধায়ক কিনে সরকার গড়েছে বিজেপি। কর্পোরেট গ্রাসে বিপন্ন সংসদীয় গণতন্ত্র। মানুষের ন্যূনতম অধিকারও বিপর্যস্ত।

● বিগত দুই বছরে বিশেষত করোনা সঙ্কটকালে মোদি মন্ত্রীসভার কম করে নয়জন সদস্যের সম্পত্তি নজিরবিহীন ভাবে বেড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও তাঁর পুত্রের দুর্নীতি নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। মানুষের সর্বনাশের সময়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে সম্পত্তি বাড়িয়েছেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

● ক্ষমতায় এসে প্রথম থেকেই শিক্ষাজগত দখলের ষড়যন্ত্রে মেতেছে মোদি সরকার। বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে ক্যাম্পাস। তারই সঙ্গে উৎসাহিত হয়েছে শিক্ষার বেসরকারিকরণ। অতিমারিতে অন লাইন ক্লাসের নামে বৈষম্য বহুগুণ বেড়েছে। বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। ২০২০ সালের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে আরও বাড়বে বৈষম্য, বেসরকারিকরণ, গেরুয়াকরণ।

● মোদি সরকারের আমলে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন চরিত্র বিপন্ন। বিচার ব্যবস্থা, মিডিয়া, নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কসহ সব প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য নিশ্চিত করতে চায় আর এস এস, বিজেপি।

● বিগত সাত বছর ধরে সরকার বা শাসক দলের অপকর্মের প্রতিবাদ করলেই তাঁদের দেশদ্রোহী বলা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন, ইউ এ পি এ'র মতো বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ করে কৃষক, ছাত্র ও মহিলাদের এন আর সি - সি এ এ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছে। কারাগারে শহিদ হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী। কৃষক আন্দোলন দমনে প্রতিবাদীদের হত্যা করতেও পিছপা হয় নি বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার বা বিজেপি নেতারা। ইউ এ পি এ, এন আই এ আইন সংশোধন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সন্ত্রাসকে অবাধ করার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সীমান্তে রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করে বি এস এফের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকায় বি এস এফ গ্রেপ্তার, তল্লাশি, দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এভাবেই গণতন্ত্র ধ্বংস করে সামরিক রাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা চলছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে নির্বাচনী সুবিধা নিতে তৎপর বিজেপি।

● হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সরকার দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্বংস করতে চায়। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের পথে এগিয়েছে সরকার। গো হত্যা, লাভ জেহাদ, সংখ্যালঘুর প্রতি ঘৃণাকে গণ উন্মাদনায় পরিণত করে মানুষ খুনে মদত দিচ্ছে রাষ্ট্র। কাশ্মীরে আট বছরের বালিকা আসিফাকে ধর্ষণ করে খুন করা হলে, ধর্ষকদের সমর্থনে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে

এরপর ৭-এর পাতায়

মানুষ-মারা নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান

পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে বামফ্রন্টের আহ্বান

বন্ধুগণ,

দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। একদিকে যখন মহামারীর প্রভাব এখনও চলছে, অন্যদিকে তখনই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কাজ খোয়ানোর পালা চলছে। বিশেষ করে পেট্রোপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় পরিবহনের খরচ বাড়ছে, সব জিনিসেরই দাম বেড়ে যাচ্ছে। পেট্রোল-ডিজেল আজ লিটার প্রতি ১০০ টাকাও ছাড়িয়ে গেছে, রান্নার গ্যাসের দাম প্রায় হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পেট্রোপণ্যে সামান্য শুল্ক কমালেও এ এক প্রতারণা কেননা, এখনও দামের প্রায় ৫৫ শতাংশই আসলে শুল্ক বা কর। এ থেকে কেন্দ্রের ও রাজ্য সরকারের বিপুল আয় হচ্ছে, অথচ তার বোঝা চাপছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। বামফ্রন্টের দাবি—পেট্রোপণ্যে কেন্দ্রীয় শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। রাজ্য সরকারকেও কর কমিয়ে মানুষকে কিছুটা রেহাই দিতে হবে।

শুধু পেট্রোপণ্য নয়, অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে খাদ্যপণ্যের। বিশেষ করে ভোজ্য তেল, ডাল, মশলা, তরিতরকারির দাম রোজ বাড়ছে। জীবনদায়ী ওষুধসহ অন্যান্য ওষুধের দামও ক্রমবর্ধমান। কেন্দ্রীয় সরকার তিন কৃষি আইনের সঙ্গেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের যে সংশোধনী করেছে তার ফলে মজুতদারি, কালোবাজারি বেড়ে খাবারের দাম চড়ছে। দেশের বিরাট অংশের মানুষ যে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন তা সুপ্রিম কোর্টও বলেছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান নেমে এসেছে ১০১-এ।

নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, কাজ খোয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। মহামারীর প্রথম ঢেউয়েই কাজ হারিয়েছিলেন কয়েক কোটি মানুষ। তার অর্ধেকই আজ আর কাজ ফিরে পাননি। প্রত্যেক মাসের শেষে হিসাব মতই দেখা যাচ্ছে নতুন করে কাজ হারাচ্ছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। ছোট মাঝারি ব্যবসার নাভিশ্বাস। এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষ বিপুল পরিমাণে চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। সমগ্র দেশেরই এই চিত্র। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র আরও খারাপ। এখানে বিগত দশ বছর ধরে শিল্প তৈরি হয়নি, গ্রামে কৃষির সঙ্কট, সেখানেও কাজ মিলছে না। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ কোনো সুরক্ষা ছাড়া, মজুরির নিশ্চয়তা ছাড়া ঝুঁকি নিয়ে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম যে কোনো একটি পথে উপার্জনের জন্য মরিয়া লড়াই চালাচ্ছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে সঙ্কট তীব্র হচ্ছে। গোটা দেশে কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে চাইছে মোদী সরকার। তার বিরুদ্ধে এক বছর ধরে রাস্তায় নেমে লড়াই চালাচ্ছেন কৃষকরা। রেগার কাজে বছরে সামান্য কয়েকদিন কাজ পাওয়া যায়, মজুরিও বকেয়া। বামফ্রন্টের দাবি, রেগার কাজ বছরে ২০০ দিন করতে হবে, মজুরি বাড়াতে হবে, বকেয়া মজুরি দিতে হবে। অন্যথায় গাঁয়ের ছোট-প্রান্তিক কৃষক, খেতমজুরের বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছেন না। দেশের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম দাবি, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনী নিশ্চয়তা চাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি উপেক্ষা করছে। আমাদের রাজ্যে যে সহায়ক মূল্য ঘোষিত হয় তার থেকে অনেক কম দামে বিক্রি করতে কৃষক বাধ্য হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যে কৃষক পরিবারগুলি জড়িয়ে পড়ছেন ঋণের ফাঁদে, বেসরকারি সংস্থার ঋণের চাপে আত্মহত্যার স্রোত বইছে।

এই সময়েই বিভাজনের বিষ ছড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। দেশের সরকারের মদতে সংখ্যালঘু, দলিতদের ওপরে আক্রমণ চলছে; ঘৃণা ছড়াতে লাগাতার অসত্য প্রচার চলছে। ধর্মপরিচয়কে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে, রাজনীতির জন্য ব্যবহার করে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধানের মূল্যবোধ ধ্বংস করা হচ্ছে। এ কাজ বিজেপি যেমন করছে, তেমনই এ রাজ্যে তৃণমূল বিভাজনের কৌশলকে ব্যবহার করছে। মোদী-মমতা উভয়েই চান দেশের মানুষ ধর্ম-জাতপাত-গোষ্ঠীর পরিচয়ে ভাগ হয়ে থাকুক, আর তার ওপরে চলুক স্বৈরাচারী রাজত্ব। একদিকে মোদী বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের জন্য দমনমূলক আইন প্রয়োগ করছে, অন্যদিকে এরাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন। ভোট লুঠ থেকে প্রতিদিনের নাগরিক অধিকার আক্রান্ত।

আমাদের রাজ্যে কিছু সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ প্রচার ও হৈ হৈ করা হচ্ছে, বাস্তব তেমন নয়। বিরাট অংশের মানুষই এই প্রকল্পের উপকার পাচ্ছেন না। বিশেষ করে আদিবাসী, তফসিলী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এ রাজ্যে আক্রান্ত, এমন রিপোর্ট করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাও।

কেন্দ্রের সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প জলের দরে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল, ইস্পাত থেকে বিমা —কোনো ক্ষেত্রই বাকি থাকছে না। এ থেকে মুনাফা লুঠছে কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবার। দেশের মানুষ যখন খেতে পাচ্ছেন না তখন মহামারীর সময়ে ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা সম্পদ বেড়েছে আম্বানিদের। পশ্চিমবঙ্গেও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারীকরণের কোপে পড়েছে। জাতীয় সম্পদের এই লুঠ আমরা মেনে নিতে পারি না।

মহামারীর সময়কে ব্যবহার করে শিক্ষায় বাণিজ্যকে তুঙ্গে তোলা হয়েছে। অনলাইন পড়াশোনার নামে দরিদ্রতর, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিভাজন দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক হতে চলেছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই মানুষ-মারা নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেই লড়াই করতে হবে। প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। রাজ্যের সমস্ত শ্রমজীবী, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে এই প্রতিবাদে সামিল হতে বামফ্রন্ট আহ্বান জানাচ্ছে।

বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দল সি পি আই (এম), সি পি আই, এ আই এফ বি, আর এস পি, আর সি পি আই, এম এফ বি, ওয়ার্কার্স পার্টি ও বলশেভিক পার্টি রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে নভেম্বর মাসব্যাপী রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচিতে যুক্ত হন।

বিনীত

বিমান বসু

সভাপতি

বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ ১৮ নভেম্বর, ২০২১

- **পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, ভোজ্য তেল ও ওষুধের লাগাতার দাম বৃদ্ধি—**
- **নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে—**

নভেম্বর মাসব্যাপী পথসভা-অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি

বর্তমান স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজ্যের সর্বত্র প্রচার-আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করুন।

কমরেড পরিতোষ চন্দ অমর রহে

আর এস পি'র নেতা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কম. পরিতোষ (মুকুল) চন্দ গত ১৭ নভেম্বর রাত্রে চলে গেলেন চির ঘুমের দেশে। অসম রাজ্যে দলের সর্ববিধ কর্মকান্ডে নিবিড়ভাবে প্রায় আজীবন যুক্ত ছিলেন কম. মুকুল চন্দ। তাঁর দেহাবসানে একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বছর। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি প্রয়াত হন।

ধুবড়ি বি এন কলেজে পদার্থ বিদ্যার সুখ্যাত অধ্যাপক হিসেবে শহর ও শহরতলির অসংখ্য বিদ্যার্থীর কাছে তিনি ছিলেন অতি শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক। আবার ধুবড়ি, গৌরীপুর সহ অসমের অসংগঠিত ক্ষেত্রের অসহায় সহস্রাধিক শ্রমকারী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার সুবাদে তিনি ছিলেন অতি শ্রদ্ধেয় এক নেতা। ইউ টি ইউ সি পতাকাতলে সংগঠিত বহুসহস্র দরিদ্র বিড়ি শ্রমিকদের একান্ত কাছের মানুষ। তাঁদের সমবায় সংগঠিত করে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এইসব অতিদরিদ্র মানুষের কাছে পথ প্রদর্শক। প্রশ্নহীন সততার সঙ্গে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর বিশেষ অবদান বিস্মৃত হবার কোনো কারণ নেই। নিরভিমান, সদা হাস্যময় এবং গভীর জ্ঞানে উদভাসিত মননসম্পন্ন এমন এক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর জীবনাবসান বড়ই বেদনার। এসব ক্ষেত্রে বয়স কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

মুকুলদার পিতা ছিলেন রেল কর্মচারী, ধুবড়ি তাঁর কর্মস্থল। আদতে পূর্ববঙ্গের মানুষ। মুকুলদার জন্ম ধুবড়ির বাসগৃহেই। উন্নত মেধার ছাত্র হবার সুবাদে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কম. উপেন ভট্টাচার্যর বিশেষ যত্নে মুকুল চন্দ অতি অল্প বয়সেই মার্কসবাদ লেনিনবাদের পাঠ গ্রহণ করেন এবং আর এস পি'র সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রয়াত কম. পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। পরেশ- মুকুলের যৌথ উদ্যোগে দলের কর্মকাণ্ড একদা বিশেষ গতি পেয়েছিল।

মুকুল চন্দর জীবনাবসান অবশ্যই বামপন্থী গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমরা তাঁর অমলিন সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

কম. পরিতোষ চন্দ (মুকুল) লাল সেলাম।

কম. পরিতোষ চন্দ (মুকুল) অমর রহে॥

মোদী মমতার পৌষমাস, আম-জনতার সর্বনাশ

সনৎ ঘোষ

এবার হেমন্ত ঋতু পর্যন্ত দফায় দফায় অতিবৃষ্টি বিঘের পর বিঘে জমির শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। প্রকৃতির মর্জি আর পেট্রোপণ্যের অপ্রতিহত মূল্যবৃদ্ধির যুগলবন্দিতে এক ধাক্কায় আনাজের দাম প্রতি কিলোগ্রামে কম করে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। রাজ্যের প্রায় সব বাজারে এই অবস্থা। পরিস্থিতি সামলাতে প্রাণান্ত হচ্ছে আমজনতার।

পরিসংখ্যান বলছে, অক্টোবর মাসে পণ্য-পরিষেবার পাইকারি দামে বৃদ্ধির হার বিগত পাঁচ মাসে সর্বোচ্চ ১২.৫৪ শতাংশ। দেশজুড়ে জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধি যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেট্রল, ডিজেলের দাম লিটার পিছু একশোর গণ্ডি পেরিয়েছে, নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। আর তাই দেশে মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি যে এসবের অন্যতম কারণ তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক বাজারদর বা রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলির উপর নির্ভর করে জ্বালানির দাম বাড়ছে—এই যুক্তি খাড়া করেই মুখে কুলুপ এঁটেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

তেলের দামের রদবদল আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওপর নির্ভর করে এবং বিশ্বে কেবলমাত্র পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলোই তেলের দাম নির্ধারণ করে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে দেশজুড়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে তার প্রভাব পড়ে। এখন অপরিশোধিত তেলের উৎস এবং কোথা থেকে সংগৃহীত হয় তা সংক্ষেপে একটু জেনে নেওয়া যাক। ভূগর্ভ থেকে যে তরল পদার্থ তোলা হয় তার নাম পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়াম নামকরণ হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দ 'petra (rock)' এবং 'oleum (oil)' থেকে। এই কারণে পেট্রোলিয়ামকে অনেক সময় 'rock oil' বা মিনারেল অয়েল বলা হয়। এটি এক ধরনের বাদামী বর্ণের অপরিশোধিত তেল। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। যে সব দেশে পাওয়া যায় তার ওপর অন্যান্য দেশ নির্ভর করে। পৃথিবীর যে সব দেশে সবচেয়ে বেশি খনিজ তেল পাওয়া যায় সেগুলো হলো সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, নাইজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (আমেরিকা), কুয়েত, কানাডা ও লিবিয়া।

জ্বালানির জন্য বিশ্বের সকলের তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে। কারণ তেলের উপর ভর করেই আধুনিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। বিশ্বের শক্তির উৎসের এক তৃতীয়াংশের বেশি দখল করে রেখেছে তেল। তেল ও গ্যাস মিলে আমাদের বিদ্যুৎশক্তির এক চতুর্থাংশ সরবরাহ করে থাকে। তাই বিস্ময়ের অবকাশ নেই যে তেলের দাম তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক দাম। তেল যার অধীনে থাকবে তার অর্থনীতিও তত সচল থাকবে। তেলকে আয়ত্বে রাখার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের এত সংঘর্ষ।

এবার স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশ্বের তেল বাজার বা ওপেক (OPEC) একমাত্র দায়ী? না, পেট্রোল ডিজেলের এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো সরকারের চাপানো কর বা শুল্ক। সাধারণ মানুষকে পেট্রোল পাম্প থেকে যে দামে পেট্রোল, ডিজেল কিনতে হয় তার মধ্যে ৬০-৭০ শতাংশ হলো কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারি শুল্ক বা কর। বর্তমানে পেট্রোপণ্যের মূল্য অনুযায়ী লিটার পিছু পেট্রোল ৩২.৯০ টাকা এবং ডিজেলে ৩১.৮০ টাকা কর এবং সেস নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, এর মধ্যে রাজ্য সরকারেরও ভাগ রয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানান, তেলের উপর ধার্য কর এবং সেস-এর মধ্যে রাজ্য সরকার পেট্রোলে পাচ্ছে ১৮.৪৬ টাকা/লিটার এবং ডিজেলে ১২.৫৭ টাকা/লিটার। পেট্রোল ও ডিজেল থেকে কেন্দ্র তিন ধরনের শুল্ক-সেস আদায় করে। (১) বেসিক এক্সাইজ ডিউটি, (২) স্পেশাল অ্যাডিশনাল ডিউটি এবং (৩) কৃষি পরিকাঠামো ও সড়ক এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সেস। এর মধ্যে কেবল বেসিক এক্সাইজ ডিউটি বাবদ কেন্দ্র যে শুল্ক আদায় করে সেটাই রাজ্যগুলোর সাথে ভাগাভাগি হয়। অর্থ কমিশনের ফর্মুলা অনুযায়ী, কেন্দ্র নেয় ৫৯%, রাজ্যগুলো পায় ৪১% । জিএসটি শুরু হওয়ার আগেও পেট্রোলের ক্ষেত্রে বেসিক এক্সাইজ ডিউটির পরিমাণ ছিল লিটার পিছু ৯.৪৮ টাকা এবং ডিজেল ১১.৩৩ টাকা। রাজ্যগুলো ওই শুল্কের ৪১% ভাগ পেত। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ওই দুই জ্বালানির বেসিক এক্সাইজ ডিউটির পরিমাণ লিটার পিছু কমিয়ে করেন ১.৪০ টাকা (পেট্রোল) এবং ১.৮০ টাকা (ডিজেল)। পাশাপাশি কৃষি পরিকাঠামো এবং সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সেস বাড়িয়ে লিটার পিছু পেট্রোল ২০.৫০ টাকা এবং ডিজেলে ২২ টাকা ধার্য করেন। ফলে, রাজ্যগুলো যেখানে প্রতি লিটার পেট্রোল বিক্রি থেকে কেন্দ্রীয় শুল্কে ভাগ পায় মাত্র ৫৭ পয়সা (১.৪০ টাকার ৪১%), কেন্দ্রের কোষাগারে যায় ৩২.৩৩ টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলো ভাগ পায় ৪১ পয়সা, কেন্দ্রের ভাঁড়ারে যায় ৩১.৩৯ টাকা।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে যখন মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে তখন মে-জুন মাসে তখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৯ ডলার, সে সময় ভারতে পেট্রোলের দাম ছিল লিটারে ৭২ টাকা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলার কিন্তু আমাদের দেশে পেট্রোলের দাম ১০৭ টাকা থেকে ১১০ টাকার মধ্যে। মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০১৮-এর অক্টোবর অবধি দেশে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমেনি। কারণ ওই দুই জ্বালানির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক সেস বৃদ্ধি। ২০১৪ জুন থেকে ২০১৬-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে মোদী সরকার দেশে লিটার পিছু পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রিতে কেন্দ্রীয় শুল্ক-সেস যথাক্রমে ১১ টাকা ও ১৩ টাকা বৃদ্ধি করেছে। কোভিডের কারণে গত বছর জানুয়ারি-এপ্রিলের মধ্যে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম যখন প্রায় ৭০ শতাংশ পড়ে যায়, মোদী সরকার তখন পেট্রোল-ডিজেলে শুল্ক সেস যথাক্রমে ১০ টাকা এবং ১৩ টাকা লিটার পিছু বাড়িয়ে দেয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায় ২.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা (২০১৯-২০ অর্থ বছর) থেকে লাফিয়ে ৩.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা (২০২০-২১ অর্থ বছর) হয়ে যায়।

২০১৭ সালে জিএসটি শুরু হওয়ার পর রাজ্যগুলোর হাতে শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা বলতে অবশিষ্ট রয়েছে কেবল পেট্রোল-ডিজেল, মদ এবং স্ট্যাম্প ডিউটি। এর মধ্যে, মোদী সরকার পেট্রোল-ডিজেলে কর-শুল্ক কাঠামোকে এমন করে তুলেছে যে ওই দুই জ্বালানীর ক্ষেত্রে ভ্যাটই রাজ্যগুলোর প্রধান আয়ের উৎস। তেলের উৎপাদন শুল্কের উপর ডিলারের কমিশন জুড়ে যে দাম দাঁড়ায় তার ওপর রাজ্য সরকারের ভ্যাট ও সেস জুড়ে রাজ্যভিত্তিক দাম স্থির হয়। বিপুল পরিমাণ উৎপাদন শুল্কের সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের কর যুক্ত হওয়ায় তেলের দাম আকাশছোঁয়া। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম হ্রাস পেলেও লাভবান হন না ভারতীয়রা। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম তলানিতে। তবু মোটা টাকা দিতে হচ্ছে জ্বালানি কিনতে। মূলত তেলের দামের ওপর কেন্দ্র ও রাজ্য যে অতিরিক্ত কর চাপায় তাদের নিজেদের স্বার্থে, তার ফলেই আসল দামের থেকে অনেকটা বেশি খরচ করতে হয় আমআদমিকে।

পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সাথে সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একের পর এক তোপ দাগেন। কোভিড পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে কেন্দ্র অন্তত চার লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, সব রাজ্যকে তার ভাগ দেবার দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুদিন আগে কেন্দ্র পেট্রোল ও ডিজেলের উপর থেকে যে সামান্য শুল্ক কমিয়েছে, তার রেশ ধরে বিজেপি শাসিত কিছু রাজ্য ভ্যাট কমিয়েছে এবং এর ভিত্তিতে এ রাজ্যেও সরকারকে ভ্যাট কমানোর দাবি তুলেছে বিজেপি। যদিও রাজ্য সরকার ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ মাস পেট্রোল-ডিজেলের উপর ১ টাকা কর হ্রাস করেছিল। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাজারের সমস্ত জিনিসের যে দাম উর্দ্ধগামী, সে ব্যাপারে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। উভয়পক্ষই তাদের নিজেদের অবস্থানে অটল রয়েছেন। আমজনতার অসুবিধাতে তাদের কী? তারা তো বহাল তবিয়তে আছেন।

২৬ নভেম্বর আর এস পি'র ডাকে দিল্লি চলুন

৫-এর পাতার পর

বিজেপি। জাতীয় পতাকার এমন অপমান স্বাধীন ভারতে আর হয় নি।

- সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি দলিত নারীদের ওপর ধর্ষণসহ অত্যাচারও বহুগুণ বেড়েছে। এন আর সি'র নামে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাড়ছে ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার। দেশের নাগরিকদের বে-নাগরিক করতে চাইছে সরকার। তাঁদের সমস্ত অধিকার লুণ্ঠিত।
- বিপন্ন সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। দিল্লি রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রের আধিপত্য বাড়ানো হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে তিন টুকরো করে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনা হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলোপ করে, রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে সে রাজ্যের বাসিন্দাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। প্রশাসন, কৃষি, শ্রম, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পরিবেশ সর্বক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা কমিয়ে কেন্দ্রীয় আধিপত্য বাড়ানো হচ্ছে।
- দেশের ইতিহাস বিকৃত করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। স্কুল কলেজে পাঠক্রমের বিরূপ পরিবর্তন চলছে।

দাবি :

১) নয়া কৃষি আইন, বিদ্যুৎ আইন ও শ্রম বিধি বাতিল করতে হবে।

২) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন পুনরায় লাগু করে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত জিনিসের দাম (পেট্রো পণ্যসহ) কমাতে হবে।

৩) খরচের দেড়গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি কৃষকের থেকে ফসল কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) দেশের সম্পদ বেচে দেওয়া চলবে না। বেসরকারিকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের নীতি বদলাতে হবে।

৫) দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করা চলবে না।

৬) রেশনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে পেটভরা, পুষ্টিকর খাবারের অধিকার দিতে হবে।

৭) প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম আয় ও সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করতে হবে।

৮) পেট্রোজাত পণ্যে জি এস টি লাগু করে দাম কমাতে হবে। কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়িয়ে, পরোক্ষ কর কমাতে হবে।

৯) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রতিটি রাজ্যের স্থানীয় সম্ভাবনার ভিত্তিতে শ্রম নিবিড় কুটির শিল্প, কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে তুলতে পরিকল্পনা নিতে হবে। চাই কর্মসংস্থানমুখী সর্বজনীন উন্নয়নের বিকল্প মডেল।

১০) ইউ এ পি এ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক আইন বাতিল করে রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা বন্ধ করতে হবে।

১১) নির্বাচনী বন্ড তুলে দিতে হবে।

১২) পি এম কেয়ার্স ফান্ডের হিসেব প্রকাশ করতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দুর্নীতির উচ্চ পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই।

১৩) স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জিডিপি'র ৬ শতাংশ ও শিক্ষায় ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষার্থী বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে।

১৪) এন আর সি ও সি এ এ বাতিল করতে হবে। সর্বোপরি কর্পোরেট তোষণকারি নীতিগুলি বাতিল করতে হবে।

১৫) লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যাকারীদের চরম শাস্তি চাই।

সংসদ অভিযানের সমর্থনে পানিহাটিতে পথসভা

গত ৯ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার আরএসপি পানিহাটী লোকাল কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৬ নভেম্বর আরএসপি'র পার্লামেন্ট অভিযানের সমর্থনে পথসভার আয়োজন করা হয় আজাদ হিন্দ নগরে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আরএসপি লোকাল সম্পাদক কম. দিলীপ দে, এছাড়া সভাতে বক্তব্য রাখেন আরএসপি রাজ্য কমিটির সদস্য কম. পঙ্কজ দাস, পিএসইউ রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. প্রসেনজিৎ দাস, সায়ন্তন চক্রবর্তী ও আরএসপি নেতা কম. শঙ্কর ভট্টাচার্য।

Vol. 68 Issue No. 38 শনিবার ১৩ নভেম্বর, ২০ নভেম্বর ২০২১ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

৩০ অক্টোবর গোসাবার উপনির্বাচন সম্পর্কে

রাজ্যের দক্ষিণতম প্রান্তে সুন্দরবনের গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র। গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া, মোল্লাখালি, কুমীরমারি, রাধানগর প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে এই বিধানসভা অঞ্চল। সমস্ত অঞ্চলগুলিই অদূর অতীতে দুর্গমই ছিল। রাজ্যে বাম আমলে নদীবেষ্টিত এসব অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৌকা, ভুটভুটি প্রভৃতির ব্যবহার ছাড়া একটি দ্বীপ থেকে অন্য কোথাও পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে অবশ্যই পথঘাট বেশ উন্নত হয়েছে। দোকানপাট, হাটবাজার প্রভৃতি রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়। প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্যই আঞ্চলিক বাজারগুলি থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। সেসবের জন্য প্রায় একশ কিলোমিটার পেরিয়ে কলকাতায় আসার কোনো প্রয়োজন আর নেই বললেই চলে।

গোসাবা অঞ্চলে বিদ্যালয় আছে অনেকগুলি। কলেজ বলতে শুধুমাত্র পাঠানখালির হাজি দেশারত্ কলেজ। বাম আমলে বিদ্যালয় শিক্ষায় যে ব্যাপকতা ও যত্ন ছিল এসব অঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি। এই অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের প্রায় নিয়ম করে কলকাতা নির্ভর হতে হয়। অনেককাল যাবৎই এইসব অঞ্চলের উচ্চশিক্ষা লাভে ইচ্ছুক কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

গোসাবার বিধানসভা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল মোটামুটি শান্তিপ্রিয়তা। মানুষ সাধারণভাবে মারামারি, বোমাবাজি, দুর্বৃত্তসুলভ আচরণ এবং সেসবের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপনে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। দু'চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত এই অঞ্চলটি মোটামুটি শান্তই ছিল। তবে সুন্দরবনের বিশ্বখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপদ্রব বরাবরই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানুষের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তোলে।

সুন্দরবনে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অত্যধিক বেশি। এদের জীবিকা মুখ্যত নদী বা জঙ্গলনির্ভর। নদীতে মাছ ও মীন সংগ্রহ, জঙ্গলে কাঠ, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করেই বহুসংখ্যক নারীপুরুষ কায়ক্লেশে বেঁচে থাকেন। বাঘ বা কুমীরের আক্রমণে বহু মানুষের জীবনহানি প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা এইসব অঞ্চলে। কঠিন জীবনযাপন।

দীর্ঘ বহুকাল সুন্দরবনের এইসব অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আর এস পি'র নেতা কর্মীরা। সুদূর অতীতে হ্যামিলটন সাহেবের জমিদারির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধতা করে দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষা করে গেছে আর এস পি। কিংবদন্তীসুলভ নেতা কম. গজেন মাইতি, সেবকদাস, অরিন্দম নাথ প্রমুখর নাম আজও বহু মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। তাঁদের জীবনবোধ এবং কর্মকাণ্ড এখনও বহু মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। একসময় ভূমিহীন কৃষক আন্দোলনে হাজার হাজার বিত্তহীন মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন আর এস পি নেতৃবৃন্দ। গ্রামে গ্রামান্তরে বহুসংখ্যক গরীব মানুষ এখনও প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বীকার করেন সেসব ইতিহাস।

সময় পাল্টেছে। এক ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতোই এই অঞ্চলের জনজীবনের সম্পূর্ণ অধিকার কায়েম করেছে। এই আধিপত্যবাদী দুর্বৃত্তদের ভীতি প্রদর্শনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়তই বিব্রত। এদের তোলাবাজি এবং কাটমানির তাণ্ডব সন্ত্রস্ত করে রাখে নাগরিক জীবন। থানা পুলিশ বিগত দশ বছর যাবৎ এইসব কুখ্যাত সমাজবিরোধী শক্তির নিয়ন্ত্রণে। অতএব সারা বছর জুড়ে এদের দৌরাত্ম্য বিনা বাধায় চলে। কোথাও কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ হলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল আশ্রিত মাতব্বররা। দুর্গম অঞ্চল। সুতরাং সংবাদ মাধ্যমের নজর এসব অঞ্চলে থাকে না বললেই চলে। সংবাদ মাধ্যমের যে সামান্য অংশটি এইসব দুর্বৃত্তদের অপকর্ম রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারতো, তাও দুর্গম অঞ্চল বলে সম্ভব নয়। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়েই সব অপকর্ম প্রতিদিন প্রতি রাতে সংঘটিত হচ্ছে।

গোসাবা অঞ্চলে দীর্ঘকাল আর এস পি'র সাংগঠনিক প্রভাব অটুট ছিল। মানুষের ঘরে ঘরে বলতে গেলে, আর এস পি সমাদৃত। ফলে দুর্বৃত্তদের আধিপত্য বিস্তারে বাধার সম্মুখীন হতে পারে বলেই এই সব সমাজবিরোধীরা ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চল থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বামপন্থী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আর এস পি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রথমাবধি কঠোর অবস্থান নেয়। সংগঠনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং বাইরের লাগাতার আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সামর্থ্য না থাকার ফলে বামপন্থী প্রতিবাদী শক্তি কালক্রমে পিছু হটে। অন্যদিকে প্রশাসনের উচ্চমহল থেকে স্থানীয় বিডিও বা পুলিশ থানার অপার সহায়তায় তৃণমূল কংগ্রেসের মৌরসিপাট্টা জাঁকিয়ে বসে।

এসব ছাড়াও গ্রামে গরীব মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন রাজ্য সরকারের অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে উঠেছে। রেশন থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে গেলে অঞ্চলের তৃণমূলীদের ওপর কিছুটা নির্ভর করতেই হয়। এমনকি, কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রতিষেধক টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রেও জল্লাদ বাহিনীর ভূমিকা। শস্য হিসেবে ধান উৎপাদিত হবার পর সহায়কমূল্যে তা সরকারের সংগ্রহ হিসেবে বিক্রি করতে গেলেও ওই বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করার মতো জটিল অবস্থা চলছে রাজ্যের নানা অঞ্চলে। সুন্দরবন বিচ্ছিন্ন কোনো উপত্যকা নয়।

বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকে ন্যূনতম প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখাতে সম্মত নয় চলমান স্থিতাবস্থা। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য বামপন্থীদের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা, হতমান করা এবং পূর্ণত অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা। এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকায় কয়েকটি টিভি চ্যানেল বা অনেক সংবাদ মাধ্যম। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে আসর বসে কোনো কোনো বহুল প্রচারিত চ্যানেলে সেখানে, রাজ্য বা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কোনো বিতর্ক আলোচনা নেই। বিজেপি অথবা তৃণমূল; যেন এই দুটি রাজনৈতিক শক্তিই এই রাজ্যে ক্রিয়াশীল। ইংরেজিতে বলে 'বাইনারি'। দ্বিপক্ষীয় শক্তি বিন্যাসের অবস্থিতির উদবাহু প্রচার যেন অবিরত মানুষের মন থেকেই বামগণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে।

টেলিভিশনের পর্দায় নিবিষ্ট চিত্তে চোখ রাখেন না এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। অর্ধচেতন বা অচেতন মানুষ টেলিভিশনের ওপর আস্থা রাখেন। যা প্রচার হয় তা, বিশ্বাস করেন। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ এই অবস্থা চলছে। এর ফলে ইদানিংকালের ভোটে বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অন্যান্য বহুবিধ কারণের মধ্যে এটিও পশ্চিমবঙ্গের ভোটে বাম বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

এসব বিষয় স্মরণে রেখে যদি বিগত ৩০ অক্টোবর ২০২১ সংঘটিত উপনির্বাচনের ফলাফলগুলি দেখি তাহলে, পরিস্থিতিটি আলোচনায় আনা বা উপলব্ধি করা সহজতর হয়। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, গোসাবা অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ যে সাংগঠনিক দুর্বলতা আর এস পিকে হতমান করেছে তা গোপন করার কোনো প্রয়াস বর্তমান আলোচনায় রয়েছে। আদৌ তা নয়। তবে মনে রাখা ভাল যে, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট ছলে বলে কৌশলে দখল করার পর থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই বামশক্তিকে ধ্বংস করে চলেছে। ওরা বেছে বেছে যে অঞ্চলে যে বামপন্থী দল বেশি শক্তিশালী তাদের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ শাণিত করেছে।

অনেকে হয়তো মনে করেন যে, তৃণমূল সিপিআই(এম) এর বিরুদ্ধে। ওদের পর্যুদস্ত করাই তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। আদৌ তা নয়, ওদের লক্ষ্য বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি যেখানে যে প্রবল তাকেই খতম করা। সেই হিসেবে গোসাবা-বাসন্তী অঞ্চলে অন্য যে কোনো বামপন্থী দলের তুলনায় আর এস পি অনেক বেশি সংগঠিত এবং শক্তিশালী। নানা দুর্বলতা প্রকট হলেও এই সত্যি অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আরএসপি'ই প্রধান শত্রু বলে বিবেচিত হয় এবং দলটিকে খতম করার জন্য যা যা করা যায় সবই করেছে তৃণমূলীরা। এই আক্রমণ সম্মিলিত বামশক্তিও রুখে দিতে পারেনি। রাজ্যের যেসব অঞ্চলে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য আক্রমণের পরেও বামপন্থী দল বা দলগুলি সংগঠন ধরে রাখতে পেরেছেন তাদের অবশ্যই লাল সেলাম প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, বর্তমান শাসকদলের সংগঠিত আক্রমণ দক্ষিণবঙ্গে বেশি প্রবল। ইদানিংকালে উত্তরবঙ্গের দু'একটি জেলাতেও পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু হয়েছে।

৩০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে গোসাবা এবং দিনহাটায় রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে শাসকদলের প্রার্থীরা জয়ী। সমস্ত ক'টি কেন্দ্রের পর্যালোচনায় না প্রবেশ করে শুধুমাত্র গোসাবা নিয়েই বর্তমান আলোচনা। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছেন। অতীতে কোনোদিন এত ব্যবধানে কেউ জেতেন নি। কৌতুককর হলেও দেখা যায় যে, অনেকগুলি বুথে বামফ্রন্টের আরএসপি প্রার্থী কম. অনিলচন্দ্র মণ্ডল কোনো ভোটই পাননি। এমন পোলিং বুথের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। ধরা যাক ২০০ নম্বর বুথ। শাসক দলের প্রার্থী পেয়েছেন ৯৩৫টি ভোট আর অনিলচন্দ্র মণ্ডল পেয়েছেন মাত্র ৮টি ভোট। মাত্র কয়েকমাস আগে এই বুথে সদ্য প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা পেয়েছিলেন ৫১২টি ভোট। আর এবারে তুলনায় অনেক কম পরিচিত প্রার্থী পেলেন চারশরও বেশি ভোট। কোন যাদুবলে এটা হতে পেরেছে তা, ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

অন্য একটি বুথ ২০১ নম্বরে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল ৫১০টি ভোট পেয়েছেন আর বামপ্রার্থীর ঘরে শূন্য। ২০২ নম্বরে বামপ্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ২টি ভোট আর তৃণমূল ৫২৯টি। গত সাধারণ নির্বাচনে যে ভোট ছিল তার তুলনায় অনেক বেশি। ২০২(এ) বুথে একই চিত্র। তৃণমূল পেয়েছে ৬৫৫ যা গতবারের তুলনায় ২০০রও বেশি। এভাবে টানা প্রায় সমস্ত বুথেই প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গোসাবা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটের নামে বিলকুল প্রহসন হয়েছে। এসব হিসেব দেখে অনেক বামকর্মী বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অনেকে বামপন্থী দলের কাজকর্মে হতাশ বা উদাসীন হয়ে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি অথবা বলা ভাল যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্দেশ্য ঠিক তাই। বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের হতাশ করে ফেলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেই ওদের উদ্দেশ্য সফল।

শুধুমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রিক বা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমস্ত কর্মসূচি নির্ধারণের প্রবণতাটি বাম দলগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে। ভোটে অংশগ্রহণ যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের স্বার্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি ঐকান্তিক-ভাবে গড়ে তোলা। সেই কাজটি দীর্ঘকাল কিছুটা উপেক্ষিত। সর্বত্রই মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির নিরসনে আরও যত্নের সঙ্গে শ্রেণিগত ঐক্য গড়ে তুলে অগ্রসর হতে হবে।

নদীয়া জেলায় আর এস পি উদ্যোগে নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন

গত ৭ নভেম্বর নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর রানাঘাট, ধুবুলিয়া, কল্যাণী সহ বিভিন্ন লোকালে দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে ১০৫তম নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে কল্যাণী লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে আরএসপি'র ডাকে ভারত বাঁচাও দিবস উপলক্ষে দিল্লী অভিযানকে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র :

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দীপাবলীর প্রাক্কালে ৫ নভেম্বর রানাঘাটে আরএসপি'র উদ্যোগে প্রগতিশীল ও মার্কসীয় পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনে আরএসপি'র নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সুনীল খাঁ, শফিকুল ইসলাম, বাচিক শিল্পী তাপসী সিংহ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-